দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাক্-বুদ্ধদেব বাংলা সমালোচনা

প্রকৃত অর্থে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্কিম চন্দ্রের হাতে। তাঁর আগেও কিছু কিছু কাজ হয়েছিল পরে তা অনেক বিস্তৃত হয়। বঙ্কিমের আগে ঈশ্বর গুপ্ত যে কাজ করেন তাকে বলা যায় সাহিত্য সম্বন্ধে একটা সচেতনতা। তবে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব রচনা করে নূতন কালের বাংলা সাহিত্যের আদর্শ তৈরী করেছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি সে দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাসকে আমরা চারটি পার্ব বিন্যস্ত করতে পারি -

ক) প্রাক্ - বঙ্কিম বাংলা সমালোচনা খ) বঙ্কিম যুগের সমালোচনা

গ) রবীন্দ্র যুগের বাংলা সমালোচনা এবং ঘ) রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সমালোচনা।

। ক ।

প্রথম পর্বের বাংলা সমালোচনা সাহিত্য সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত ছিল। এই কালের সমালোচক হিসেবে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করতে হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ রঙ্গলাল 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' লিখে এক্ষেত্রে যথার্থ প্রথম স্রষ্টার স্থান অধিকার করেন।[১] এর পরেই পাই ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরকে তাঁর 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৫৩ সালে রচিত। এঁদের অনেক আগেই অবশ্য ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকরে' দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে তৎকালীন সাহিত্যের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করাতে চেয়েছিলেন। তিনিই প্রথম ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও কবিওয়ালাদের প্রামানিক জীবনীসহ কাব্যসংগ্রহ প্রকাশে উদ্যোগ নেন। ঈশ্বরগুপ্তের পরে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছাড়া সমালোচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকায় নতুন গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হতো, মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের সমালোচনা[২] করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বয়ং। এছাড়া, 'বৃত্রসংহার' - এর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদনের সতীর্থ বন্ধু রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদনের কাব্যের সমালোচনা কারেছিলেন। এঁরা কেউ-ই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আলঙ্কারিক রীতির গণ্ডী অতিক্রম করেন নি।

বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে মধুসূদনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি নতুন ধরনের কাব্য, নাটক ইত্যাদি রচনা করে চিঠিপত্রে এই নতুন আন্দোলনের মূলসূত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন 'ছাত্রাবস্থায় কবিতা সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তা খুব কাঁচা হলেও এর মধ্যেই মধুসূদনের সাহিত্যবিন্তার প্রকাশ ঘটে। তিনি লিখেছিলেন -

> 'Altho', there are striking differences between these writers [chaucer, spencer, shakespeare, Milton], - yet they resemble each other in one point - an alesence of art and dependence upon nature while their successors from pope downwards are remarkable for qualities quite the reverse ....[৩]

মধুসূদন ঠিক সাহিত্য বিচারক ছিলেন না, সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনাও তিনি করেননি। তবে, অসংখ্য পত্রাবলীতে নিজস্ব সাহিত্যরুচির পরিচয় আছে।

সেগুলি সাহিত্য বিচার নয়, সাহিত্যে নূতন মূল্যবোধের প্রথম দৃষ্টান্তমাত্র।[৪]

। খ ।

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যথার্থ সাহিত্যবিচারের সূত্রপাত হয়। তাঁর সাহিত্যভাবনা ছড়িয়ে আছে নানা রচনায়।'বিবিধ প্রবন্ধ'এর প্রথম ভাগে (১৮৮৭ খ্রীঃ), 'উত্তর চরিত', গীতিকাব্য, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসদিমোনা'; দ্বিতীয় ভাগে (১৮৯২ খ্রীঃ) 'ধর্ম এবং সাহিত্য', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা', 'বাঙ্গালার ভাষা' - এই প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে অনুশীলন অংশে মানবধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। দীনেশ চরণ বসুর 'মানস বিকাশ' কাব্যের সমালোচনা পরে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে রূপান্তারিত হয়। এছাড়া, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রথম খণ্ডের সমালোচনা (বঙ্গদর্শন ১২৮১ / ১৮৭৪ খ্রীঃ), দ্বিতীয় খণ্ডের সমালোচনা (বঙ্গদর্শন ১২৮৪ / ১৮৭৭ খ্রীঃ), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীর ভূমিকা (১২৯২ / ১৮৮৫ খ্রীঃ), পারীচাঁদ মিত্র প্রবন্ধ (১২৯৯ / ১৮৯২ খ্রীঃ) - এইসব প্রবন্ধগুলি সমালোচক বঙ্কিবচন্দ্রের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও রসবোধের পরিচয় বহন করে।

সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র মানবাশ্রয়ী চিন্তার ধারক ছিলেন।[৫] মানুষের জীবন ও সমাজকে সবার উপরে স্বীকার করে নেওয়াই ছিল রেনেসাঁসের লক্ষণ। বঙ্কিম চন্দ্রও সাহিত্যকে সমাজ ও জীবনের অঙ্গীভূত করে দেখেছেন। সমালোচনা কর্মেও তিনি এই তত্ত্বকেই গুরুত্বে দিয়েছেন। 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থেও তিনি এই মনুষ্যত্ব ধর্মের কথাই বলেছেন -

> সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষাত্বেই সুখ। .... আমাদের
> সমুদয় বৃত্তিগুলির স্ফুর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।[৬]

তাঁর সাহিত্যচিন্তা নীতিবর্জিত ছিল না। এই নীতি সঙ্কীর্ণ বা গোঁড়া রক্ষণশীল নীতি নয়।

> বঙ্কিম চন্দ্র ইহবাদী, জীবনমুখী, সমাজমুখী।[৭]

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের কৃত্রিম জীবন বিমুখ রীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি তিনি বা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের অলকাপুরীর কথাও ভাবেন নি তিনি। বঙ্কিমচন্দ্র যে নীতির কথা বলেন এর পরিচয় আছে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে -

> চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে,
> সেটি কি ? ... উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌর্ণ
> উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন ... তাঁহারা সৌন্দর্যের
> চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।[৮]

তিনি সাহিত্য কর্মকে নিছক আনন্দ বলে মনে করেন নি। এর সচেতন উদ্দেশ্যও স্বীকার করেন নি। তবে তিনি মনে করেন কাব্য সার্থক হলে তা চিত্তশুদ্ধি ঘটাবে। আবার, 'ধর্মতত্ত্বে'র ২৭ সংখ্যক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন - কাব্য মানুষের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের প্রধান সহায় এবং এই কাব্যের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন -

> তাহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি
> বিধান করনে।[৯]

বঙ্কিম চন্দ্রের আলোচনায় একই সঙ্গে সৌন্দর্য্যও আছে আবার চিত্তশুদ্ধিও আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই দুই দিককেই মিলিত করতে চান, তিনি কল্যাণ ও সুন্দর দুইকেই এক করে দেখেন।

পাশ্চাত্ত্য সমালোচনায় কাব্যসৃষ্টিকে সামগ্রিক রূপে দেখা হয়। 'উত্তরচরিতে' বঙ্কিম এই সামগ্রিক বিচারভঙ্গী প্রথম প্রয়োগ করেন -

> এক একখানি প্রস্তর পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখিলে তাজমহলের
> গৌরব বুঝিতে পারা যায় না .... সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।
> এস্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের
> পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণ তত্ত্বকেও অগ্রাহ্য করে বলেছেন -

> যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই।[১১]

তাঁর সাহিত্যভাবনা ক্লাসিক্যাল রীতির দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তিনি বলেছেন -

> যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।[১২]

তাঁর সাহিত্যবিচারের তত্ত্বে একটা দ্বিমুখী ভাবনা ছিল। তিনি যাকে স্বভাবানুকারী বলেন তাকে প্রকৃতির অনুকারী বলা যায়। আবার তিনি সাহিত্যকে প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র বলেন না, তাকে স্বভাবাতিরিক্ত বলে মনে করেন। এই কথার প্রমান পাই দীণবন্ধু মিত্র সম্বন্ধে তাঁর লেখায়। সেখানে Realism -এর উপর Idealize করার কথাও তিনি বলেছেন, এতে মনে হয় সাহিত্যকে প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু এটাই তাঁর একমাত্র বক্তব্য নয়। সাহিত্য এর অতিরিক্ত কিছু। এই দিক থেকে দেখলে মনে হয় স্বভাবাতিরিক্ত বলতে তিনি আদর্শায়িত বাস্তবের কথা বলেছেন।[১৩] একে অনেকটাই অ্যারিষ্টটলীয় চিন্তা মনে করা যায়। কারন, তাঁরই লেখায় সাহিত্য প্রকৃতির অনুকরণ আবার অনুকরণের চেয়েও কিছু অতিরিক্ত এই ধারনা পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র একেবারে অনুকরণতত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেছেন তা বলা যায় না। অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিক সমালোচকদের প্রধান বিষয় ছিল মাইমেসিস বা অনুকরণ। বঙ্কিম চন্দ্র এখানে ক্লাসিক রীতিকে অনুসরণ করে স্বভাবানুকরণ তত্ত্বের কথা বললে ও ক্রমশ রোমান্টিক কাব্যভাবনার দিকেই এগিয়েছিলেন। 'গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'শকুন্তলা মিরান্দা এবং দেসছিমোনা' প্রবন্ধে এই পরিচয় আছে। তাই তিনি একইসঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বও ব্যবহার করেছেন। তিনি

বলেছেন -

যাহা সত্যর প্রতিচ্ছবিমাত্র নহে - তাহাই সৃষ্টি।[১৪]

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন কবির প্রধান গুণ সৃষ্টি ক্ষমতা। সেই সৃষ্টি প্রতিকৃতিমাত্র নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪-৭৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের সমালোচনা লেখেন। এই সমালোচনায় তিনি অষ্টাদশ শতকীয় নীতির মানদণ্ড ব্যবহার করেছেন। কাব্যের বক্তব্যকে প্রকাশভঙ্গীর উপরে স্থান দিয়েছেন। সমালোচক বঙ্কিমের মতে 'বৃত্রসংহার' কাব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য ধর্ম-নীতির জয়ঘোষণা।

তাঁর কৃতিত্ত্বের অপর পরিচয় পাওয়া যায় 'দীনবন্ধু মিত্র' (১৮৭৬) ও 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত' (১৮৮৫) এই দুটি প্রবন্ধে। অষ্টাদশ শতকীয় সমালোচনায় সমাজচেতনা ও ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, ঊনবিংশ শতকীয় সমালোচনায় ব্যক্তিচেতনা ও কবি ব্যক্তিত্ত্বকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। বঙ্কিমের সাহিত্যচেতনা সমাজচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও এই প্রথম তিনি শিল্পীর ব্যক্তিত্ত্বকে আলাদা মূল্য দিয়েছেন। 'দীনবন্ধু মিত্র' সমালোচনায় তিনি বলেন -

যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি ...।
গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কিনা
বলিতে পারি না।[১৫]

এই প্রবন্ধে তিনি কবির অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতির গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এর উপরে স্থান দিয়েছেন কবির কল্পনাশক্তিকে। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি ছিল কিন্তু তার কল্পনাশক্তি ছিল না। এ থেকে তাঁর তত্ত্বে কল্পনাশক্তির গুরুত্ব বুঝতে পারি। 'ঈশ্বরগুপ্ত' প্রবন্ধেও এই নতুন সূত্রের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। কবিতাবলীর আলোকে কাব্যবিচারের একটা নতুন পথ এদুটি প্রবন্ধে তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কাব্যকে কবির সঙ্গে মিলিয়ে বিচার, কবির আত্মপ্রকাশের সূত্রে বিচার রোমান্টিক ভাবনারই একটি দিক। এতে মনে করা যায় যে তিনি ক্রমশঃ সেই রোমান্টিক সমালোচনার দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

। গ ।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে সমালোচক হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল লেখক নন, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি। একদিকে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্য সমালোচনা করেছেন আবার সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। সাহিত্য সমালোচনা অর্থে তিনি সাহিত্য বিচারকে বুঝেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন -

যাকে আমরা সাহিত্য সমালোচনা বলি সাহিত্যবিচার শব্দটাকে
আমি সেই অর্থে ব্যবহার করেছি।[১৬]

রবীন্দ্রনাথ বিচার কথাটি ব্যবহার করলে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ব্যাখ্যাকেই অবলম্বন করেছেন,

বিচারকে তেমন গুরুত্ব দেননি।[১৭] তাঁর মতে, সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা সমালোচকের কাজ। এখানে সমালোচনা অর্থে তিনি তিনটি প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন - পরিচয়, ব্যাখ্যা এবং বিচার। এদের উপরেই তিনি সাহিত্য সমালোচনাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন।[১৮]

সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আর একটি বিষয়েরও নাম করেছেন। দীনেশ চন্দ্র সেনের 'রামায়ণীকথা'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে পূজা কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখেছেন -

> পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা,
> .... যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত।
> তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত
> করেন মাত্র।[১৯]

এমনও হতে পারে যে, তিনি সমালোচনা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যার কথা বলেছিলেন সে ব্যাখ্যা স্বাধীন ব্যাখ্যা নয়, তা পূজার সহগামী, সে ব্যাখ্যা সমালোচনার অঙ্গ।[২০] ঠিক একইভাবে বলা যায়, যে পরিচয় ভক্তি বিগলিত তা সমালোচনার অঙ্গ।[২১] কিন্তু, তাহলেও সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি যে বিচার কথাটি ব্যবহার করেছেন, এখানে তাকে সহগামী মনে হয় না। কেননা, বিচার বা মূল্যায়ণ আর ভক্তি বিগলিত পূজা সম্পূর্ণ পৃথক বৃত্তির ক্রিয়া।[২২] ফলে, কোনটি কে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সমালোচনা বলেছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে পূজা বলেছেন। এর দশ বছর আগে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি রচিত হয়। সেখানে সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন -

> সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম একহস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণ
> কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন,
> আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।[২৩]

এখানে সমালোচক বিচারক। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৯৪ সাল। 'রামায়ণ' এর দশ বছর পরে লেখা। 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯২৯ সাল। অর্থ্যাৎ, ৩৫ বছরের সময়সীমার সমালোচনা সম্পর্কে তিনবার তাঁর মত পরিবর্তন ঘটল, 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের এক দেড়বছর পরে 'লোসাহিত্যে'র 'ছেলেভুলানের ছড়া' (১৩০১) লেখা হয়। সেখানে তাঁর বক্তব্য -

> যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক, তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়ি পাল্লা
> আছে, তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি
> বাঁধি বোল বাহির করিয়া যে কোনো রচনা তাহাদের নিকট উপস্থিত
> করা যায় নিঃসঙ্কোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া
> দিতে পারেন।[২৪]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধটিতে মূলতঃ সাহিত্যবিচার এবং সাহিত্য বিচারের

ধ্রুব মানদণ্ডের ওপর এবং বিচারকের যোগ্যতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তার বক্তব্য -

> বিচারকের প্রতিভা আছে, এক একজনের পরখ করিবার শক্তিও
> স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ,
> তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না। যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন,
> এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন।[২৫]

এখানে তিনি সাহিত্যের কতগুলি নিত্য লক্ষণের কথা বলেছেন সেই নিত্য লক্ষণগুলিকে অবলম্বন করেই সাহিত্য বিচারের যে মানদণ্ড স্থির হয়, সেই মানদণ্ডও নিত্য। সমালোচকের কাজ সেই মানদণ্ডের সহায়তায় সাহিত্য বিশেষের বিচার করা। অর্থ্যাৎ, সমালোচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান নি। তিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করতে করতে এগিয়েছেন, তাই স্বাভাবিক নিয়মেই মতপরিবর্তন ঘটেছে। 'সাহিতত্যের স্বরূপ' গ্রন্থে 'সাহিত্য বিচার' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -
সাহিত্যে কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ সেটা অধিকাংশ স্থলেই

> যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে
> আপনাকে ঘোষণা করে।[২৬]

এখানে তাঁর আপত্তি বিচারকের অযোগ্যতার বিরূদ্ধে। আবার, একই নিবন্ধে বলেছেন -

> অবশ্য যাঁরা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষ কালগত মমত্বের দ্বারা
> সম্পূর্ণ অভিভূত নয়, তাঁদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত।[২৭]

বোঝা যাচ্ছে কিছু নিরাসক্ত সমালোচকও আছেন যাঁদের সাহিত্যবিচার নিছক ব্যক্তিগত ভালো-মন্দ লাগার জবানবন্দী নয়। অর্থাৎ, তাঁদের সাহিত্যবিচার নিরাসক্ত বুদ্ধির বিচার, আদর্শভিত্তিক বিচার। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় প্রকৃত সমালোচকের মূলধন হল -

> তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায়
> তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়।[২৮]

এই মননধর্ম "মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শ হীন।"[২৯] এই প্রবন্ধের প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচারের কোনো সর্বজনীন আদর্শকে স্বীকার করেন নি, তাঁর বক্তব্য হল - সমালোচক সাধারণতঃ তাঁর নিজের মনের বিশেষ সংস্কার দিয়ে সাহিত্যবিচার করেন। তিনি বলেছেন -

> এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে,
> তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে।[৩০]

অর্থ্যাৎ, সমালোচক যা নিয়ে অগ্রসর হন তা একেবারেই তাঁর দলগত ও শ্রেণীগত সংস্কারের প্রবর্তনা মাত্র। যে সমালোচক এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন একমাত্র তিনিই তাঁর সমালোচনাটিকে সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনাকেই সাহিত্য করে তোলা। সেই রকম সাহিত্য একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।[৩১]

অর্থ্যাৎ, রবীন্দ্রনাথের মতে, সমালোচনার মূল্য তার মতামতে নয়, তার নির্ভুলতায় বা তার মূল্যায়ণের যথাযথতায় নয়। সমালোচনার মূল্য তার প্রকাশ সৌন্দর্যে, তার নিজস্ব সাহিত্য গুণে, তার স্বাধীন রস সৃষ্টির ক্ষমতায়।[৩২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার সমগ্র ইতিহাসটিকে মোট চারটি পর্বে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথমার্দ্ধে উন্মেষ ও প্রস্তুতিপর্ব, দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি পর্ব।[৩৩] উন্মেষ পর্ব, বাল্য কৈশোর ও প্রথম যৌবনের রচনা। এর অধিকাংশই 'সমালোচনা' (১৮৮৩) গ্রন্থে স্থান পায় এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এগুলিকে বর্জন করেন। প্রস্তুতিপর্ব প্রধানতঃ মধ্য ও পরিণত যৌবনের রচনা। ব্যবহারিক সমালোচনার দিক থেকে এই পর্ব গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা প্রবন্ধগুলি যেমন - 'মেঘদূত' (১৮৯১), 'রাজসিংহ' (১৮৯৪), 'বঙ্কিবচন্দ্র' (১৮৯৪), 'কাব্যে উপেক্ষিতা' (১৯০০) - এই পর্বেই রচিত। ব্যবহারিক সমালোচনার দিক থেকে এটি পরিণত পর্ব হলেও তাত্ত্বিক দিক থেকে খানিকটা অপরিণত।[৩৪] প্রতিষ্ঠা পর্বের সূচনা 'বঙ্গ দর্শন', প্রকাশ (১৯০১) থেকে। এই পর্বের অপর প্রান্তে আছে 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশকাল (১৯০৭)। পর্বটির স্থিতিকাল এই সাত বছর। পরিণতি পর্বের সূচনা 'সবুজপত্র' প্রকাশের (১৯১৪) পর থেকে। এই পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধ 'সাহিত্যের পথে (১৯৩৬) 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩)-এ স্থান পেয়েছে। এছাড়া 'personality' (১৯১৭), 'The Religion of Man' (১৯৩১), 'The Religion of on Artist' (১৯৫৩) এইসব উল্লেখযোগ্য ইংজেরী গ্রন্থও এই পর্বে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনাকে সূত্রাকারে সাজিয়ে গিলে কয়েকটি ভাগ দেখা যায়। যেমন -

১) রোমান্টিক গোত্রের সাহিত্য রীতির প্রতিষ্ঠা ।

২) তাঁর লেখায় বাইরের বাস্তবতার জায়গায় অনুভূত সত্যের মর্যাদা অনেক বেশী।

৩) সাহিত্যের কাজ প্রথম জীবনে সৌন্দর্যসৃষ্ট বলে ভাবলে ও পরে তিনি সাহিত্যে আনন্দমূল্যকেই বড় করে তুলেছেন।

৪) সাহিত্যের জনকল্যাণমূলক ভূমিকা তিনি স্বীকার করেন না কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে জনকল্যাণের ভূমিকা স্বীকার করেন।

৫) শেষ পর্বের সাহিত্যের তত্ত্বে প্রাধান্য পেয়েছে বা বলা যায় ক্রমোন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের তুলনায় মানব প্রকাশের তত্ত্ব। সাহিত্য তাঁর কাছে মানব প্রকাশ।

প্রথম বা উন্মেষ পর্বে যে সাহিত্যতত্ত্ব অল্পবিস্তর অবিন্যস্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তা খাঁটি রোমান্টিক লিরিক কবির সাহিত্যতত্ত্ব।[৩৫] তত্ত্বের দিক থেকে এই রোমান্টিকতা উনিশ শতকের ইংরেজ কবিদের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীট্স ও কোলরীজের রোমান্টিকতার অনুসরণ। দ্বিতীয় পর্ব যাকে প্রস্তুতিপর্ব বলা হয়েছে, সেটি এক হিসেবে মোড় ফেরার কাল।[৩৬] পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকতার দিক থেকে

ভারতীয় বা ঔপনিষধিক রোমান্টিকতার দিকে মোড়-ফেরা। তৃতীয় বা প্রতিষ্ঠাপর্বে ভারতীয় ঔপনিষধিক ব্রহ্মবাদের মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়েছে। শুধু, ঔপনিষধিক নয়, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা এই পর্বে বলিষ্ঠ। পরিণতি পর্বের যথার্থ সূচনা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে থেকে। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ সৃজনে ও সাহিত্যভাবনায় অনেকবেশি আধুনিক। সাহিত্যভাবনায় এই আধুনিকতার মধ্যেও একটা ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়েছে। যার নিরসন শেষ গ্রন্থ 'সাহিত্যের স্বরূপে'ও হয়নি।

গোত্রবিচারে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে রোমান্টিক বা ক্লাসিক - এরকম চিহ্নিত করা কঠিন হলেও রোমান্টিকতার লক্ষণ যে শেষপর্যন্ত তাঁর ভাবনার মধ্যে ছিল তা বলা যায়। কিন্তু, পরিণতিপর্বে, প্রথম দিকের রোমান্টিক ধারনার অনুষঙ্গগুলোকে তিনি অনেকটা বদলে নিয়েছেন। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বে অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব অনুভূতি ও উপলব্ধির। কিন্তু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিরা অনুভূতি বলতে যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বলেননি। তাঁর কাছে অনুভূতি নিছক ফীলিং নয়।[৩৮] সেখানে আছে কল্পনারও গুরুত্ব এবং এই কল্পনাকে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা কলেন, যা উনিশ শতকী রোমান্টিকদের মধ্যে ছিল না। রোমন্টিকেরা অনুকরণবাদ বিরোধী। তাঁদের মতে, সাহিত্য অনুকরণ নম, সৃষ্টি। কিন্তু রবীন্দ্র নাথের অনুকরণবাদ কিছুটা অন্যরকম। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্য জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ। পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিকেরা প্রকাশবাদী। তাঁরা কবির আত্মপ্রকাশ ও ভাবপ্রকাশের কথা বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন মানবপ্রকাশের কথা।[৩৯] রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শিল্পের ব্যাপারে লীলাবাদী, স্বাধিকারবাদী। কিন্তু রোমান্টিকদের মতো শিল্পের জন্য শিল্প এই নীতি তিনি বিশ্বাস করেন না। তাঁর বক্তব্য শিল্প কোনো কিছুর দাসত্ব করেনা। তাছাড়া, রোমান্টিকরা ব্যক্তিমানুষের উপর বিশেষতঃ শিল্পী মানুষের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষ ও একলা মানুষের কথা বলেননি, বলেছেন ইতিহাসের মানুষের কথা, তাঁর ভাষায় বলা যায় 'মানব সম্মিলেনর কথা মানব সমগ্রতার কথা। রোমান্টিকরা বিষয় ও বিষয়ীব ঐক্যের কথা বললেও কার্যতঃ তাঁরা বিষয়ীকেই গুরুত্ব দেন বেশী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে বিষয় ও বিষয়ী তুল্যমূল্য। কাজেই সাহিত্য ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ রোমান্টিক গোত্রের হলেও তাঁর মধ্যে একদিকে সুস্পষ্ট রোমান্টিকতা, অন্যদিকে তা থেকে উত্তরণের প্রয়াস - এই দুইয়ের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

তাঁর লেখায় বাইরের বাস্তবতার জায়গায় অনুভূত সত্যের মর্যাদা অনেক বেশী। রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভূতি নিছক আবেগসর্বস্ব ব্যাপার নয়, এ হল সমগ্র মানবচৈতন্যের একটি অনবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় -

> অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে
> হয়ে ওঠা; শুধু বাইরের থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই
> মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।[৪০]

এর মধ্য দিয়েই বিষয় ও বিষয়ী, অনুভবকারী ও অনুভবের বস্তু একাকার হয়ে যায়। সাহিত্য বা ললিতকলার লক্ষ্যই হল এই বিষয়ও বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়ার আনন্দকে মূর্ত করে তোলা।[৪১] তিনি (রবীন্দ্রনাথ)

বলতেচান অনুভূত বস্তু সমূহের অভিঘাতেই মন সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা ঘটে। এই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সাহিত্যের অবিরাম সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলছে।

> হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে
> বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।[৪২]

এখানে, হৃদয়ের জগৎও বাইরের জগৎ এই দুই জগতের কথা বললেও পরিনত বয়সে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র হৃদয়ের জগতের কথা বলেছেন। 'সাহিত্যের পথে' বইটি প্রথম প্রকাশের (১৯৩৬) সময় গ্রন্থের ভূমিকায় (অমিয় চক্রবর্ত্তী কে লেখা চিঠিতে ৮ই আশ্বিন ১৩৪৩) রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কাজ হিসেবে সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। তাঁর মনে হয়েছে সৌন্দর্য রচনাই সাহিত্যের প্রধান কাজ। কিন্তু এখানেই তাঁর বক্তব্য

> এই মতের সঙ্গে সাহিত্যের ও আর্টের অভিজ্ঞতাকে মেলানো যায়না।
> .... সাহিত্যের অভিজ্ঞতাকে প্রচলিত সৌন্দর্যের ধারনায় ধরা গেলনা।[৪৩]

এর আগে পর্যন্ত ও তিনি বলতেন সাহিত্যের কারবার সৌন্দর্যকে নিয়ে, কারণ তা আনন্দ দেয়। কিন্তু পরে তাঁর মনে হয়

> যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে, আর সেটাই সাহিত্যের সামগ্রী।[৪৪]

সাহিত্যের কাজ সৌন্দর্য রচনা হলেও লক্ষ্য হ'ল আনন্দ। কিন্তু পরবর্তীকালে সাহিত্যের লক্ষ্য হিসেবে আনন্দের কথা বললেও সাহিত্যের কাজ হিসেবে সৌন্দর্যের কথা স্বীকার করেননি তিনি। কারণ প্রচলিত অসুন্দরও সাহিত্যে আনন্দ দিতে পারে। যেমন ভাড়ু দত্ত সাহিত্যের সুন্দর, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। তাছাড়া, সৌন্দর্যরচনাই সাহিত্যের কাজ একথা বললে প্রথমতঃ আমাদের প্রথাগত সৌন্দর্যের কথাই মনে আসে। তাহলে মনে হতে পারে জীবনে যা অসুন্দর, ভয়াবহ, ঘৃনার, তারা সাহিত্যে জায়গা পেতে পারে না, এ গেল ব্যবহারিক দিকের কথা, তত্ত্বগত দিক থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যেহেতু তাঁর সাহিত্য অভিজ্ঞতায় আনন্দকেই প্রাথমিক উপলব্ধি হিসেবে জেনেছিলেন, তাই একে বোঝার জন্য অন্য কোনো উপাদানের গুরুত্বের কথা বলেননি। যেহেতু সাহিত্য রসিকের অভিজ্ঞতাতে সুন্দর বলে আলাদা কিছু নেই, সেজন্যে সাহিত্যে সুন্দর কথাটির প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয়। অর্থ্যাৎ, তিনি সাহিত্যে আনন্দমূল্যকেই একমাত্র ভেবেছেন। এই আনন্দ নিজেকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

> ওথেলের সঙ্গে ওথেলো হয়ে, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর অন্ধতা হয়ে,
> কর্ণের সঙ্গে তাঁর নিস্ফল বীরত্ব হয়ে, মানুষ নিজেকে ফিরে ফিরে
> দেখে অর্থ্যাৎ আত্মোপলব্ধি করে এবং আনন্দ পায়।[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দতত্ত্বে উপনিষেদের উত্তরাধিকার স্বীকৃত। আনন্দ কথাটা উপনিষদের, অর্থটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেকোনো অনুভূতিই আনন্দ। সুখ হোক, দুঃখ হোক, জীবনের বিপুল ভাণ্ডার থেকে যত রকমের অভিজ্ঞতার আস্বাদ পাওয়া যাক না কেন, রবীন্দ্রনাথ এর সবকিছুকেই আনন্দ বলেছেন।[৪৬]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সব রকম অভিজ্ঞতাকে আনন্দ বললে ও আনন্দ সম্ভোগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। নির্বাচনের যথাযথ মানদণ্ড কোনটি হবে - সমাজকল্যাণ, নীতিবোধ, অথবা লোকহিত - সেটিই প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন - সাহিত্যে উপলব্ধি অর্থ্যাৎ আনন্দই শেষ কথা।

> এর পরে আর কোনো কথা নেই ... এ প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে,
> আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি-না ?[৪৭]

অবশ্য সাহিত্যের প্রসঙ্গে, তিনি যে কল্যাণ বা হিতসাধনের কথা কখনোই তোলেন নি তা নয়। তবে, সাহিত্যের আনন্দকরতাকে তিনি শেষ কথা ভেবেছেন বলেই সত্য থেকে মঙ্গলকে, সুন্দর থেকে মঙ্গলকে কিংবা আনন্দ থেকে মঙ্গলকে তিনি পৃথক করতে পারেন না। এদিক থেকে, লৌকিক মানদণ্ডের সঙ্গে পার্থক্য যাই হোক না কেন, সাহিত্যে মানদণ্ড হিসেবে সমাজকল্যাণ, নীতিবোধ বা লোকহিত - সমস্ত নীতিবিধানেরই শেষ লক্ষ্য হ'ল - কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ বার বার বলেছেন বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হল সামঞ্জস্য। তাই হল সত্য। এর-ই নাম কল্যাণ। এই সামঞ্জস্যই সুন্দর তাই তা আনন্দকর। সুতরাং যা আনন্দকর তা কল্যাণকর এবং যা কল্যাণকর তা সুন্দর ও আনন্দদায়ক। সে সঙ্গে একথা ও বলা যায় যা নিরানন্দকর তা অকল্যাণকর। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য সবসময়-ই কল্যাণকরে তা সবসময়-ই হিতসাধন করে। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে তা সত্যিই জনকল্যাণের কাজ তা সাহিত্যের নয়। তাই স্পষ্টতঃ সাহিত্যে জনকল্যাণের কথা না বলে তিনি সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দকরতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাহিত্য তাঁর কাছে মানবপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনায় প্রকাশ কথাটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। 'সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।'[৪৮] 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ কথাটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি সেখানে বলেছেন যে ব্রহ্মস্বরূপের যেমন তিনটি দিক থাকে - সত্যের দিক, জ্ঞানের দিক এবং অনন্তের দিক, মানবস্বরূপেরও তাই। মানুষেরও একটা হল তার সত্তার দিক, সত্যের দিক, আর একটি জ্ঞানের, তৃতীয়টি তার অনন্তের দিক। 'এটিই তার প্রকাশের দিক',[৪৯] ঐশ্বর্যের দিক তার আনন্দের দিক। কেবল টিঁকে থাকায়, কেবল জ্ঞানে মানুষের আনন্দ নেই, মহাজীবনের সঙ্গে মিলনেই আনন্দ। অর্থ্যাৎ, প্রকাশেই তার আনন্দ। এই আনন্দরসই সাহিত্যে, আর্টে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন

> প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তার প্রকাশ
> নেই। যা স্বভাবতই দীপ্যমান, সেখানেই মানুষের প্রকাশের উৎসব।[৫০]

নিজেকে মহাজীবনের মধ্যে বিস্তৃত করা, মহাজীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করা এই হল প্রকাশ।[৫১] পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যশাস্ত্রীদের মতে, প্রকাশ বা Expression-এর মূল কথা ভিতরকে বাইরে আনা, কোনো নতুন কিছু হয়ে ওঠা নয়, গোপন কিছু, প্রচ্ছন্ন যা কিছু একে চোখের সামনে আনা। রবীন্দ্রনাথ এর কোনোটিকেই পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তাঁর সাহিত্যভাবনায় প্রকাশ কেবল ভিতরকে বাইরে প্রকাশ করা নয়, রূপের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হওয়া এবং বিস্তারের মধ্য দিয়ে সত্য হওয়া।[৫২] প্রকাশের মধ্য দিয়েই সৌন্দর্যের চেতনা আর সভ্যতার চেতনা আনন্দে এসে এক হয়ে মিলে যায়। পশ্চাত্ত্য কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন প্রকাশ মাত্র। সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র কিন্তু তার পরিণাম সত্য হল ইন্দ্রিয়-মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ।[৫৩] আর মানুষকে প্রকাশ আসলে মানবসত্যের প্রকাশ। আবার, রবীন্দ্রনাথের কাছে মানব এবং বিশ্ব সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য - বিশ্বমানব ও মানববিশ্ব একই কথা। প্রকাশ অর্থে এরই প্রকাশ।[৫৪] রচয়িতার মধ্যে সে বিশ্বমানব মন — তারই প্রকাশ। সম্মিলিত মানবমন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের আধারে নিজেকেই প্রকাশ করে, এই হল রবীন্দ্র-সাহিত্য তত্ত্বের একটি অন্যতম মূল প্রত্যয়। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- মানবপ্রকাশ -

> সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।[৫৫]

প্রকাশের মধ্য দিয়েই মানুষ বহুবিচিত্র রূপের ঐশ্বর্যে আত্মপরিচয় ও বিশ্বপরিচয় লাভ করে।

। ঘ ।

রবীন্দ্রনাথের পরে সাহিত্যসমালোচক হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরী। তিনি তাঁর 'সবুজপত্রে'র (১৯১৪) মাধ্যমে বাঙালির সাহিত্যদৃষ্টিকে আধুনিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য কী, এ বিষয়ে তাঁর অভিমত স্পষ্ট।

> সমাজ কল্যাণ বা লোকশিক্ষার জন্য সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর সায় নেই।[৫৭]

তাঁর মতে, সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্য সমাজ-কল্যাণ, লোকশিক্ষা বা নীতিপ্রচার নয়, আনন্দসৃষ্টি। তাই,

> সাহিত্যে পাঠকের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করার অর্থ লেখকের
> ধর্মচ্যুতি, এই তাঁর সিদ্ধান্ত।[৫৮]

বঙ্কিমের সমাজকল্যাণমূলক নীতিকে না মেনে তিনি যেন কিছুটা রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতি, শ্লীলতা-অশ্লীলতার আলোচনাও তিনি করেছেন। 'যৌবণে দাও রাজটিকা', 'ভারতচন্দ্র', 'জয়দেব', চিত্রাঙ্গদা' ও 'কাব্যে অশ্লীলতা-আলংকারিক মত' — প্রবন্ধগুলিতে এসম্পকে তাঁর মতামতের পরিচয় পাওনা যায়।

> ফরসী সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর অশ্লীলতা সম্পর্কে
> কোনরকম শুচিবায়ু ছিলনা।[৫৯]

তাছাড়া, সাহিত্যে শ্লীলতা - অশ্লীলতার প্রশ্নে গুরুত্ব দিতে তিনি রাজি হননি। আর্টের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিই তাঁর কাছে বড় কথা।[৬০] আদর্শগত দিক থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যাদর্শকে খানিকটা যেন রবীন্দ্র-সাহিত্য চিন্তানির্ভর বলা যায়।

রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলালের আলোচনা না করলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার যে ঐতিহ তা প্রায়শই বিপরীত মনোধর্ম বিশিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের নিউক্লাসিক মতাদর্শ রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণতই বর্জন করেছিলেন। তিনি যে নূতন রোমান্টিক চিন্তা থেকে বাংলাসাহিত্যের সৃষ্টি এবং বীক্ষণ করলেন তার অভিনবত্ব সেদিন বাঙালী পাঠক বুঝতে

পারেনি। সাহিত্যকে যে কোনো একটা মানদণ্ডে ভাল বা মন্দ বলে ছাপ মেরে দেওয়া যায়না - তার মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের বৈশিষ্ট সন্ধান করতে হয় - সাহিত্য যে কবির আত্মপ্রকাশ এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট দান। যদিও এ তাঁর নিজস্ব ভাবনা নয়। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশের তত্ত্ব থেকে তিনি মানব প্রকাশ পর্যন্ত সাহিত্যের ধারণাকে বিস্তৃত করেছিলেন।

মোহিতলাল সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৃষ্টির ধারণাথেকেই বিচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তিনি ক্রমে এই ধারণা বর্জন করেন। যদিও কোনোদিন সম্পূর্ণতঃ তা করতে পারেননি। সাহিত্যকে কেবল সাহিত্যের আন্তর্ধর্ম অনুযায়ী বিচার করবার একটা ইচ্ছা তার ছিল বটে তবে বহুক্ষেত্রে তার সঙ্গে দেশও জাতির তদানীন্তন আকাংক্ষা মিশে গিয়েছিল। এই কারনে তাঁর লেখা সমালোচনা কেবল সাহিত্যের সাহিত্য হিসাবে নিরূপণ ছিলনা - তাঁর সঙ্গে দেশ, কাল ও জাতীর জীবনাকাক্ষার প্রশ্ন জড়িত হয়ে গিয়েছিল। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' নামে তাঁর যে বিশিষ্ট এবং বহু পরিচিত গ্রন্থ আছে সেটি এই জাতিয় জীবনভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে বিচার করবার ধারণা থেকে রচিত। এই ধরনের সমালোচনাকে বলা হয় সমাজভিত্তিক আলোচনা। যে ধারণার পত্তন ঘটেছিল তেঁইনের লেখায় এবং যার ধারাবাহিক অনুসরণ আরো অনেকে করেছিলেন। তাতে সাহিত্যকে দেশ, কাল এবং সাহিত্যকারের ভাব সমন্বয়ের ফল হিসেবে দেখাবার চেষ্টা ছিল। মহিতলাল যদিও মাত্র সেই কাজ করতে উদ্দোগী হননি তথাপি দেশও কালের এই ধর্মকে তিনি সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখতেচান। এই কারনে উনিশ শতকের সাহিত্যে-বিশ শতকের সাহিত্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করতে চান। যেমন রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে অনেক সময়ই তাঁর মন্তব্য অনুদার মনে হয়। অন্যপক্ষে তিনি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের লেখার সাহিত্যিক মূল্যবিচার অপেক্ষা তাতে প্রতিফলিত জাতীয় জীবনধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান মনে করেন। নিছক আর্ট বা নাট্যশিল্পের তাদের বিচার যেমন-ই হোক, তিনি জাতীয়তা ও মনুষ্যত্ব সাধনার দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকে জয়যুক্ত করেন। মোহিতলালের শিল্পবিচার ধর্ম এক্ষেত্রে যেন অর্দ্ধজাগর বরং জাতীয়তাবোধের আকাক্ষা অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তিনি সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কাব্যগুলিকে যে মূল্য দেন, তাঁর উত্তর কালের রচনাকে তা দিতে কুণ্ঠিত। এর কারণ প্রথম পর্বের রচনার যে সৌন্দর্য সৃষ্টি তাতে যে দেশ ও জাতির জীবনের জন্য তাঁর আকূতি এই সব-ই মোহিতলালকে আকর্ষণ করে তাঁর লেখার প্রথম পর্বে মোহিতলাল খুঁজে পান জগৎ ও জীবনের উদার মানবিকতা - যাকে তিনি সাহিত্যের মৌল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। অন্য পক্ষে শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের লেখায় যেমন সেই সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল রচনা নেই, ভাব ও ভাষার সেই আদি পর্যায়ের দায়বদ্ধতা নেই তেমনি নেই জাতীয় জীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা। যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ যুগের জাতীয় চেতনার কবি তিনি মোহিতলালের আরাধ্য। যিনি দেশবোধ থেকে আন্তর্জাতিকতাবোধে উত্তীর্ণ তিনি বর্জনীয়। তিনি যে ধরণের কাব্য তত্ত্ব রচনা করেন যাকে তিনি 'কায়াকান্তিবাদ' নাম দেন, কায়া এবং তার কান্তি সাহিত্যের ধর্ম বলে তিনি মনে করেন, উদার বিশ্লেষণে তার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেরই গুণ বা ধর্ম কিন্তু সে কথা ব্যাখ্যায় তিনি অশ্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের লেখায় যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে দেখেন তিনি তাকে নিতান্তই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের বৈশিষ্ট্য বলে তিনি উপেক্ষা করেন। আর কেবল বঙ্কিমের মধ্যেই

সেই Parsonality বা ব্যক্তিমাত্রিকতার উর্দ্ধে এক এমন সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সন্ধান পান যার দৃষ্টান্ত আর কোনো লেখকের লেখায় পাওয়া যায় না।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক লেখকদের সম্বন্ধে তাঁর সমুদ্রপ্রমাণ বিরাগ তিনি অনেক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন। সে সব রচনা অনেক সময় কেবল আধুনিক শিল্পীর দোষ কণ্ডূয়ণে সমালোচনা ধর্মকেই যেন ক্ষুণ্ন করে। আধুনিক সাহিত্যকারদের মধ্যেই তিনি প্রবলভাবে Individualism এর চর্চা দেখতে পান - এই ব্যক্তিমাত্র সর্বস্বতা যে রেনেসাঁসের জীবনধর্ম বিচ্যুত, তা যে বাঙালির জীবনবোধের বিপরীত এক মনোধর্মের চর্চা করে মাত্র - এ সব উক্তি বহু ক্ষেত্রে তিনি করেছেন। এমনো মনেহয় অনেকক্ষেত্রে চিঠি পত্রে তিনি আধুনিক সাহিত্যের লেখকদের প্রতি অনেক অশোভন মন্তব্য করে যান। তিনি অবশ্য নিজেকে বলেছেন দ্বার রক্ষক মাত্র সুতরাং যাঁরা এই সরস্বতীর গাত্রে কালিমালিপ্ত করতে চান তিনি তাদের 'চাবুক' মারতেও কুণ্ঠিতনন। কিন্তু মনে হয় এসব উক্তি সাহিত্যের মৌল ধর্মকেই আহত করে। তিনি লিখেছেন যে, সাহিত্যের ধর্ম প্রতিষ্ঠা এবং সাধারনের রুচি ও রসবোধ জাগ্রত করবার জন্য তিনি সমালোচনাকে অবলম্বন করেছিলেন। একথা ঠিকই যে অনেক লেখকই এ কাজে সমালোচনাকে ব্যবহার করেন। এলিয়ট Correction of taste বলতে যা বলেছিলেন মোহিতলালের রুচি ও রসবোধ জাগ্রতকরাটা আসলে তারই বঙ্গীয় রূপান্তর। কিন্তু এসব বিষয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত ঝাঁজ ও তীব্র মেজাজ অনেককাংশেই তাঁর লক্ষ্যপূরণে বিরুদ্ধতা করে যায়। এই কারনে জাতির সঙ্গে সাহিত্যকে অণ্বিত করে দেখতে গিয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকের বঙ্কিমচন্দ্রে শেষ আশ্রয় লাভ করেন। কেননা যে রেনেসাঁসের মানবধর্মকে তিনি বলেন সাহিত্যের ধর্ম - সেই ধর্মকে আধুনিক কবি শিল্পীরা অনেকটাই অতিক্রম করে আসেন। নব্য সমাজের কাছে তার বঙ্কিমের নীতিশাসিত জীবনবোধের ধর্মকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা এক অর্থে ব্যর্থতারই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায় ফলে মোহিতলাল বিশশতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকলেও কিন্তু কোনোক্রমেই উনিশশতকী জীবনধারা কে অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলা সমালোচনার প্রকৃত সূচনা বঙ্কিমে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যে বিস্তার ও ভাবগত ব্যাপ্তি ঘটালেন মোহিতলাল তাকে আবার সেই আদি সূত্রে ফিরিয়ে নিলেন। সেই কারনে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলালের স্থানটি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে।

নির্দেশিকা

১। সেনগুপ্ত, শ্রীসুবোধচন্দ্র, বাংলা সমালোচনা পরিচয়, কলিকাতা, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৩৭৬, পৃঃ ৬৪

২। মিত্র, রাজেন্দ্রলাল, বিবিধার্থ সংগ্রহ, অগ্রহায়ণ ১৮৭১ শক

৩। দত্ত, মধুসূদন, 'On Poetry etc', মধুসূদন রচনাবলী, কলিকাতা, সাহিত্যসংসদ, ১৯৬৫, পৃঃ ৬২২

৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ৭৬

৫। তদেব, পৃঃ ৭৮

৬। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'সামঞ্জস্য ও সুখ', ধর্মতত্ত্ব, বঙ্কিমরচনাবলী, ২-য় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ৫৫৩

৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ৮০

৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচরিত, বঙ্কিমরচনাবলী, ২-য় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, প্রথম সং ১৯৮৩, পৃঃ ১৬৯

৯। তদেব, পৃঃ ১৬৯

১০। তদেব, পৃঃ ১৬৮

১১। তদেব, পৃঃ ১৭০

১২। তদেব, পৃঃ ১৭০

১৩। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ৮৬

১৪। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বিবিধ প্রবন্ধ', উত্তরচারিত, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ১৭০

১৫। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, রায় দীণবন্ধুমিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা, বঙ্কিমরচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, পাত্র'জ, ১৯৮৩, পৃঃ ৭৬৮

১৬। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গ্রন্থপরিচয়, 'সাহিত্যের পথে', কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ২৮০

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যবিচার', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ১০০

১৮। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, কলিকাতা, ক্লাসিক প্রেস, ১৯৬৫, পৃঃ১৮৭

১৯। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'রামায়ণ', প্রাচীন সাহিত্য, কলিকাতা, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, পৃঃ ১১

২০। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ২২৭

২১। তদেব, পৃঃ ২২৭

২২। তদেব, পৃঃ ২২৭

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', আধুনিক সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ১১

২৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেভুলানো ছড়া', লোকসাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩১৪ পৃঃ ৫

২৫। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের বিচারক', সাহিত্য কলিকাতা, বিশ্বভাতরী গ্রন্থালয়, শ্রাবণ, ১৩৬১ পৃঃ ২৬

২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যবিচার', সাহিত্যের স্বরূপ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, বঙ্গাব্দ ১৩৬৫, পৃঃ ৩৪।

২৭। তদেব, পৃঃ ৩৪

২৮। তদেব, পৃঃ ৩৫

২৯। তদেব, পৃঃ ৩৫

৩০। তদেব, পৃঃ ৩৩-৩৪

৩১। তদেব, পৃঃ ৩৪

৩২। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ২৩২

৩৩। তদেব, পৃঃ ১৮৭

৩৪। তদেব, পৃঃ ১৮৮

৩৫। তদেব, পৃঃ ১৮৯

৩৬। তদেব, পৃঃ ১৮৯

৩৭। তদেব, পৃঃ ১৯০

৩৮। তদেব, পৃঃ ১৯৩

৩৯। তদেব, পৃঃ ১৯৪

৪০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যতত্ত্ব', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ১২১

৪১। তদেব, পৃঃ ১২১

৪২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের তাৎপর্য', সাহিত্য, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ, ১৩৯৮, পৃঃ ৭

৪৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, সাহিত্যের পথে, কলিকাতা বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৭-৮

৪৪। তদেব, পৃঃ ৮

৪৫। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত-পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ১১৩-১১৪

৪৬। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যসমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, সারস্বত লাইব্রেরী, ১৩৮১, পৃঃ ১৯৬

৪৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৪৪

৪৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য বিচার', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৯৩

৪৯। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তকভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩৭৯, পৃঃ১২৫

৫০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্য', সাহিত্যের পথে, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৪০০, পৃঃ ৩৭

৫১। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ় ১৩৭৯, পৃঃ ১২৬

৫২। তদেব, পৃঃ ১২৭

৫৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের প্রাণ', সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ ১৩৪৮, পৃঃ ২১৭

৫৪। রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩৭৯, পৃঃ ১২৮

৫৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিশ্বসাহিত্য', সাহিত্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশখণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ফাল্গুন ১৩৯৫, পৃঃ ৭৭১

৫৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যসৃষ্টি', সাহিত্য, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, মাঘ, ১৩৪৮, পৃঃ ১১১

৫৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, বীরবল ও বাংলাসাহিত্য, কলকাতা, সাহিত্যলোক ১৯৮৮ পৃঃ ১১৫

৫৮। তদেব, পৃঃ ১১৫-১১৬

৫৯। তদেব, পৃঃ ১১৮

৬০। তদেব, পৃঃ ১২০